

ভাবুন

বিশ্বাস করুন

অর্জন করুন

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের যা-কিছু অর্জন, বিকাশ, উত্থান—সবকিছুর মূলেই আছে ভাবনা। ভাবনাই নির্মাণ করে বাস্তবতা। ইতিবাচক ভাবনা রূপ নেয় বিশ্বাসে। আর এই বিশ্বাস দেয় শক্তি ও কর্মের অনুপ্রেরণা। অর্থাৎ ভাবনার পথ ধরেই মানুষ নির্মাণ করেছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির শিখরস্পর্শী আজকের পৃথিবী।

শত শত বছর ধরে শোষিত ও নিপীড়িত একটি জনপদ। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও সমাপ্তি ঘটে নি সর্বব্যাপী বঞ্চনার। এক পর্যায়ে সেই বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ভেবেছে নিজেদের একটি পতাকা, নিজেদের একটি রাষ্ট্রের কথা। ভাবনা একসময় রূপ নিল বিশ্বাসে। তারপর অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও সংগ্রামে রচিত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—বাংলাদেশ।

অর্থাৎ ব্যক্তি হোক কিংবা সমষ্টি—সবার বেলাতেই ভাবনার শক্তি এক চিরন্তন সত্য।

তাই ভাবনায় হোন ইতিবাচক। শুদ্ধতা, সৌন্দর্য ও সাফল্যের অনুরণনে দীপ্যমান হোক আপনার প্রতিটি চিন্তা। প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি হবেন সফল। সার্থক হবে আপনার জীবন। সমৃদ্ধ হবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। সবাই মিলে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে এক অনন্য উচ্চতায়। সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়বে এই কল্যাণতরঙ্গ।

ইনশাআল্লাহ! সব সম্ভব!!

সারা পৃথিবী আমার

quantummethod.org.bd

লক্ষ্যের পথে হেঁটে চলাই বড় কাজ



ডা. হুমায়ুন কবির

চিকিৎসাবিজ্ঞানী,
ঘুম বিশেষজ্ঞ ও লেখক।
যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি-তে
অবস্থিত ‘অ্যাপালাচিয়ান স্লিপ
ডিজঅর্ডারস সেন্টারের’ প্রতিষ্ঠাতা।
৮ ও ৯ জানুয়ারি ২০২৩
তিনি বান্দরবান লামার
কোয়ান্টাম সফর করেন।
কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের
হিকমান ক্যাম্পাস পরিদর্শনকালে
(৮ জানুয়ারি) শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের
উদ্দেশ্যে তার বক্তব্যের
নির্বাহিত অংশ তুলে ধরা হলো—

সময়কে বৃথা যেতে দিও না

মানুষের জীবনে তিনটি পর্যায়। প্রথমটি জ্ঞান আহরণের, দ্বিতীয়টি জ্ঞানকে কাজে লাগানোর আর তৃতীয় ধাপ হলো জ্ঞান বিতরণের।

প্রথম ধাপে মানুষ চারপাশ থেকে শুধু নেয়। পরিবার, শিক্ষক, গুরুজন এবং অভিজ্ঞদের কাছ থেকে সে ক্রমাগত জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। মাঝখানের পর্বে সে জীবনের জন্যে প্রস্তুত হয়, শক্ত-সমর্থ হয়, কর্মী হয়ে ওঠে। মানবজাতিকে ও পৃথিবীকে কিছু দেয়ার সময় এটাই।

এরপর শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে, পরিশ্রম করার সামর্থ্য কমতে থাকে। কিন্তু জ্ঞান বিতরণের জন্যে সে যোগ্য হয়ে ওঠে। কারণ শৈশব-কৈশোরে অর্জিত জ্ঞান ও তারুণ্যে কর্মের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে মানুষ তখন পরিণত।

তাই সময়গুলোকে বৃথা যেতে দিও না। কারণ নিজেকে গঠন করার সময়টা মানুষ খুব বেশিদিন পায় না। আর একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে যদি আমরা চলি, তাহলে পথচলা অনেক সহজ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছব, তা আমরা অনেক সময়ই জানতে পারি না। তাই বলে থেমে গেলে চলবে না। গন্তব্য বা লক্ষ্যের পথে হাঁটাই আমাদের বড় কাজ।

একা ওপরে ওঠা যায় না

আমি এদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পড়ালেখায় সবসময় একান্ত ছিলাম। তবে জীবনের অর্জনগুলো শুধু একার চেষ্টায় আসে নি। আমি চলার পথে অনেক মানুষের সাহায্য পেয়েছি। শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন সংস্কৃতির বহু মানুষের সহযোগিতা আমি পেয়েছি। কারো কারো ক্ষেত্রে এই সাহায্যের বিনিময়ে কিছু ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়তো কিছুটা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশের বেলায় কিছুই করার সুযোগ হয় নি। তবে তাদেরকে আমি কখনো ভুলি নি।

জীবন থেকে আমি শিখেছি—মানুষ কখনো একা ওপরে উঠতে পারে না। এজন্যে কখনো ভাববে না, আমার কাউকে প্রয়োজন নেই! কখনো উদ্ধত হবে না। বরং প্রস্তুত থাকবে অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়ার জন্যে। সাহায্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটা হতে পারে বুদ্ধি-পরামর্শ, পথ দেখিয়ে দেয়া, সাথে নিয়ে হাঁটা ইত্যাদি। নেয়ার জন্যেও কিন্তু মানসিক স্থিতির প্রয়োজন হয়। যত ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবে, তোমার প্রাপ্তিটাও হবে তত বেশি এবং আনন্দময়।

একইসাথে আমারও দায়বদ্ধতা আছে আরেকজনকে সাহায্য করার। তাই যখন ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে—একা নয়, পাশের বন্ধুটাকেও টেনে তোলার চেষ্টা করবে। সবসময় একে অন্যকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে। একা চলার চেয়ে পরস্পর হাত ধরে হাঁটা অনেক ভালো।

সংঘাত নয়, সহযোগিতা

জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে বসবাস করে আমার উপলব্ধি হলো, পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই আমরা মানুষ। যদি আমি অপরকে আপন করে নিতে না পারি, তাহলে তারাও আমাকে আপন করে নিতে পারবে না। আমরা দেখতে অন্যরকম হতে পারি, ভাষা ভিন্ন হতে পারে, ধর্ম ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মানুষকে আপন করে নিতে এর কোনোটিই কোনো বাধা নয়। তাই যেখানেই থাকো না কেন, চেষ্টা করবে তোমার ভেতরের মানুষটিকে প্রস্তুত করতে।

পৃথিবীতে যত সংঘাত, এর মূল কারণ একজনের চেয়ে আরেকজনকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা। এই রোগ ব্যক্তির ভেতরে, সমাজের ভেতরে ঢুকে গেলেই শুরু হয় সংঘাত। তাই নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করবে যেন কারো সাথে সংঘাত না হয়। তাহলে কেউ তোমাদের ধ্বংস করতে পারবে না, তোমরা ওপরে উঠতেই থাকবে।

এজন্যে তোমরা একটা তালিকা করতে পারো যেখানে লেখা থাকবে, ‘কার সাথে আর সম্পর্ক রাখব না’, ‘কে ডাকলে যাব না’ বা ‘কার সাথে আমি কথা বলব না’! এই তালিকাটা যদি শূন্য হয়, তাহলে বুঝবে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তুমি পেরিয়ে গেছ। সবসময় চেষ্টা করবে, তোমার এ তালিকায় যেন কেউ না থাকে।

মতের অমিল হবে এবং এটাই স্বাভাবিক। আর ভিন্নমত প্রকাশ না করলে তো জ্ঞানচর্চাও হয় না। তাই চারপাশে যেন এমন কেউ না থাকে, যার সাথে তুমি কথা বলবে না। সেটা হোক পরিবার, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী। দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও আমি তার সাথে যেন হাত মেলাতে পারি, তাকে যেন হাসিমুখে বরণ করতে পারি। কথোপকথনের পথ যেন বন্ধ না হয়। তাহলে কোনোদিন সংঘাত হবে না।

এগিয়ে চলাই জীবন

আমি যা নিজে চর্চা করি না তা অন্যকে উপদেশ দেয়ার কোনো অধিকার আমার নেই। তাই তোমাদেরকে আজ সেই কথাগুলোই বললাম, যা আমি নিজে অনুসরণ করি।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে তোমরা যে শৃঙ্খলা, নিয়ম ও সংঘর্ষের মধ্যে বেড়ে উঠছ, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে যখন পেছনে ফিরে দেখবে, বুঝতে পারবে আজকের এই প্রশিক্ষণ তোমাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।

প্রত্যাশা করি, এসময় তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত করে তুলবে। তোমাদের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না যদি নিজেরা থেমে না যাও। মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আমরা কখনো থেমে যাব না। প্রতিনিয়ত সামনের দিকে অগ্রসর হবো।

আজই শুরু করুন ডিজিটাল ফাস্টিং

২,৬১৭ ॥ আপনিও কি এই শেকলে বন্দি?

স্ক্রিনের সামনে ১০ মিনিটের জন্যে বসেছিলেন অথচ কখন যে এক-দেড় ঘণ্টা চলে গেছে টেরই পান নি—এ ঘটনা স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কাছে নতুন নয়। প্রায়ই এমন হয়। কখনো কখনো তো কয়েক ঘণ্টা সময়ও ব্যক্তির অজান্তেই কেড়ে নেয় স্মার্টফোন-স্মার্ট টিভি ও সোশ্যাল মিডিয়া। গবেষণা বলছে, স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা দিনে গড়ে ২,৬১৭ বার স্পর্শ করে তার স্মার্টফোনটি। ফোন কল, মেসেজ আদানপ্রদান, খবর পড়া, সময় দেখা, ছবি তোলা, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচরণ থেকে শুরু করে কখনো হয়তো বিনা কারণেই একেকজন দেখতে থাকে স্মার্টফোন।

সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে আসক্তি :

স্ক্রিন আসক্তি ও মাদকাসক্তির ধরনে কোনো পার্থক্য নেই। মাদকাসক্তদের মাদক সেবনের মাত্রা যেমন দিন দিন বাড়তে থাকে এবং কিছুদিন পর তারা যেভাবে তীব্র কোনো মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে, একইরকম ঘটে স্ক্রিন-আসক্তদের বেলাতেও। এভাবেই নিরীহ অনলাইন গেম খেলা শিশু-কিশোর ভায়োলেন্ট গেম বা অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়ে। আবার অনলাইন পেজ, ওয়েবসাইট বা লাইভে মাঝে মাঝে নিত্যনতুন পণ্য দেখার অভ্যাসটাই একসময় হয়ে যায় দিনরাত ব্যস্ত থাকার মাধ্যম। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ব্যক্তির স্বাস্থ্য, মন-মেজাজ, কাজ, পারস্পরিক সম্পর্কে।

তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন, নিজের ভালোর জন্যেই প্রত্যেককে এই স্ক্রিনটাইমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। দিনের একটা নির্দিষ্ট অংশে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকতে হবে। এই বিরতিকেই সহজ ভাষায় বলা হচ্ছে ডিজিটাল ফাস্টিং।

কীভাবে করবেন ডিজিটাল ফাস্টিং?

সারা দিনের হাজারো ব্যস্ততা শেষে যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন থেকে শুরু করতে পারেন এ ফাস্টিং। রাত ১১টা থেকে ভোরবেলা (ফজরের আজান) পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে করবেন এ ফাস্টিং। ডিজিটাল স্ক্রিনের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিয়ে রাত ১১টায় বন্ধ করে দিন সব ধরনের ডিভাইস।

কী পাবেন ডিজিটাল ফাস্টিং থেকে?

১. ভালো ঘুম। নিরবচ্ছিন্ন কয়েক ঘণ্টার ঘুম দেহ-মনের ক্লান্তি দূর করবে এবং সুন্দরভাবে প্রতিটি দিন শুরু করার সুযোগ মিলবে।
২. আপনার মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হবে। ফলে কাজের গতি বাড়বে এবং কমবে ভুলের পরিমাণ।
৩. আপনার সৃজনশীলতা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে যুক্ত করতে পারবেন নতুন নতুন আইডিয়া।
৪. সোশ্যাল মিডিয়া সবচেয়ে বেশি উসকে দেয় ‘না জানি কী দেখা হলো না!’ এবং ‘আমার কত কিছু নেই!’ এই অনুভূতি। এর বিপরীতে ডিজিটাল ফাস্টিং হবে প্রশান্তিময় কিছু সময় কাটানোর উৎস।

৫. বর্তমান সময়ে শিশুসহ সব বয়সী মানুষের দৃষ্টিশক্তি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো দীর্ঘক্ষণ চোখের সামনে স্মার্টফোন-ল্যাপটপ ধরে রাখা। শরীরের নানা অঙ্গের ব্যথা-বেদনার উৎসও এটি। কারণ স্ক্রিনে বৃন্দ হয়ে থাকা মানুষটি বুঝতেও পারে না একই ভঙ্গিতে শুয়ে/ বসে/ মাথা গুঁজে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করছে। ডিজিটাল ফাস্টিং এ-ক্ষেত্রে কার্যকরী লাগাম হিসেবে কাজ করবে।

সহজ কিছু পদক্ষেপ—

সবার আগে সিদ্ধান্ত নিন : ব্যক্তিজীবনের যে-কোনো উত্থান-পতন হ্রাস-ক্ষয়ের কারণ শুধু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নয়; বরং এতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত। তাই আগে নিজের সাথে বোঝাপড়া হোক। যদি আপনি সত্যিই স্ক্রিনের বন্দি হতে থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এটাই হবে আপনার প্রথম সাফল্য।

দমচর্চা করুন : অন্যান্য আসক্তির মতো ভার্চুয়াল ভাইরাস আসক্তির প্রভাব পড়ে দেহ-মনে। তাই ডিজিটাল ফাস্টিংয়ের প্রথমদিকে আপনার অস্থিরতা বেড়ে যেতে পারে। স্ক্রিন আসক্তির অস্থিরতা দেখা দিলে দমচর্চা করুন। অটোসাজেশন দিয়ে নিজেকে সামলে নিন।

মেডিটেশন করুন : ডিজিটাল ফাস্টিংয়ের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো নিয়মিত মেডিটেশন। শিথিলায়নের পাশাপাশি ৪০ দিন ভার্চুয়াল ভাইরাস মেডিটেশনটি নিয়মিত করুন। আপনার দৃঢ়তা বাড়বে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

পারিবারিক অভ্যাস গড়ে তুলুন : যে-কোনো কিছু একা চর্চা করার চেয়ে দলগতভাবে চর্চা করাটা অনেক বেশি সহজ এবং ফলপ্রসূ। কখনো কখনো নিজের মধ্যে অনীহা এলেও অন্যদের তাগিদে ভালো কাজটি করা হয়ে যায়। তাই পরিবারে সবাই মিলে করুন ডিজিটাল ফাস্টিং। দেখবেন খুব অল্প সময়ে ডিজিটাল ফাস্টিং আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ডিজিটাল ডিটক্স : ডিজিটাল ডিটক্স নামে একটি পদ্ধতি এখন বেশ জনপ্রিয়। এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় (৩/৪দিন) ডিজিটাল ডিভাইস পুরোপুরি বর্জন করতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে মানুষ এর চর্চা করছে। কারণ তারা যন্ত্রের শেকল থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে খুঁজে পাচ্ছে নিজেকে। সমস্যার জট খুলে জীবনে আসছে প্রশান্তি ও সমাধান।

ডিজিটাল ডিটক্সের লক্ষ্যে অংশ নিতে পারেন বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামগুলোতে। ডিজিটাল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রকৃতির সান্নিধ্য ও ধ্যানের সমন্বয় হতে পারে আপনার জন্যে এক দারুণ বিনিয়োগ।

তথ্যসূত্র : বিজনেস নিউজ ডেইলি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২,
ওয়েব এমডি ১২ মে ২০২১,
বিজনেস ইনসাইডার ১৩ জুলাই ২০১৬,
সাইকোলজি টুডে ৪ মে ২০১৬

এগিয়ে যান টোটাল ফিটনেসের পথে

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে যাপন ও উপভোগের জন্যে প্রয়োজন টোটাল ফিটনেস। শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক ফিটনেসের সমন্বয় হচ্ছে টোটাল ফিটনেস। কোয়ান্টাম ৩০ বছর ধরে এ ধারণাকেই জাতীয় জীবনের অনুষঙ্গ করার জন্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। আপনিও অনুশীলন করুন। অর্জন করুন টোটাল ফিটনেস।

শারীরিক ফিটনেস

শারীরিক ফিটনেস মানে শরীরের নির্দিষ্ট মাপ, ওজন ও আকার নয়। এই ফিটনেস নির্ভর করে একজন মানুষ ক্লাসিফাইনভাবে কতক্ষণ কাজ করতে পারেন, তার ওপর। তাই দেহের আকার-ওজনের ফ্যান্টাসি থেকে মুক্ত হয়ে গুরুত্ব দিন আপনার এনার্জি লেভেল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দিকে।

সেইসাথে সুস্বাস্থ্য বা শারীরিক ফিটনেসের দায়িত্ব ডাক্তার ও হাসপাতাল-ক্লিনিকের হাতে না দিয়ে নিজেকে নিতে হবে। ইচ্ছামতো চলব আর অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাব—এটি মোটেও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি নয়।

মনে রাখতে হবে, ছোট ছোট যত্ন যেমন সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলে তেমনি ছোট ছোট অযত্ন-অবহেলার কারণেই সৃষ্টি হয় রোগবালাই। তাই আসুন, নিজের দেহের প্রতি মনোযোগী হই এবং মনে চলি কিছু সহজ সূত্র :

১.
নিয়মিত দমচর্চা বা ব্রিডিং এক্সারসাইজ করুন।
বাড়বে দেহ-মনের সুস্থতা।

৪.
দিনে অন্তত ৩০ মিনিট সময়
রাখুন যোগব্যায়াম ও হাঁটার জন্যে।

২.
প্রাকৃতিক খাবার ও পরিমিত
খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হোন।
দিনের শুরুতে ভরপেট খান,
দুপুরে তার চেয়ে কম
এবং রাতে আরো কম।

৫.
দেহের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার
পাশাপাশি স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে
গোসল করা হোক প্রতিদিনের অভ্যাস।

৩.
বর্জন করুন রাত জাগার অভ্যাস। প্রতিদিন
নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোনা ও জেগে ওঠার
অভ্যাস গড়ুন। রাত ১১টার পর
সব ধরনের স্ক্রিন থেকে দূরে থাকুন।

৬.
দিনের কাজগুলো যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট
সময়ে করতে সচেষ্ট হোন।

মানসিক ফিটনেস

মানসিক ফিটনেসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
হলো দৃষ্টিভঙ্গি বা ভাবনা। কারণ আমরা
যা ভাবি আমরা তা-ই। ভাবনাকে যত
বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল রাখা সম্ভব
হবে, মানসিক ফিটনেস তত বাড়বে।

প্রধান দুটো মানদণ্ড

প্রথমত, নিন্দা ও প্রশংসা—দুটোকেই আপনি সহজভাবে নিতে পারেন কিনা। হাততালি বা কটাক্ষ-কটুকথা তা যদি আপনার কাজে কোনো প্রভাব বিস্তার না করে, তাহলে আপনি মানসিকভাবে ফিট।

দ্বিতীয়ত, যে-কোনো পরিস্থিতিতে আপনি ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিনা। প্রতিকূল সময়ে উত্তেজিত হয়ে রি-এক্ট করে ফেলেন, না সহজভাবে পরিস্থিতি সামলে নিতে পারেন? বিরক্তিকে জয় করে করণীয় কাজটি করতে পারাই মূলত মানসিক ফিটনেস।

সেইসাথে আপনি গুছিয়ে কাজ করতে পারেন কিনা। গোছানো মানে পরিকল্পিত কাজ। সমাধা করা এবং কাজ গোছানো কিন্তু এক নয়। কাজ তুলে ফেলতে পারে অনেকেই, কিন্তু সবাই গুছিয়ে কাজ করতে পারে না।

যেমন, দৈনন্দিন কাজের উপকরণগুলো গুছিয়ে রাখলে, প্রত্যেকবার খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। ফলে সময় ও শ্রম বাঁচে। কাজে আসে সচ্ছন্দ গতি ও মনোযোগ।

সামাজিক ফিটনেস

সামাজিক ফিটনেসের
প্রথম শর্ত হলো
সামাজিক হওয়া।
অর্থাৎ সমাজের
অংশ হওয়া।
ভার্চুয়াল বা অলীক জগৎ
থেকে বেরিয়ে এসে
সবার সাথে চলতে পারা।

জড়তা ভেঙে শুরু করুন

১. পরিচিত অপরিচিত বড় ছোট
নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম
দিন। নিজে উদ্যোগী না হয়ে যে
ব্যক্তি অন্যদের কাছ থেকে
সালামের প্রত্যাশা করেন, তিনি
সোশ্যালি আনফিট।

২. বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ
বাড়ান। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের
সাথে নিয়মিত দেখা করুন।

৩. সম্পর্কের মাঝে দেয়াল না
তুলে মমতার সেতু গড়ুন।

৪. বাড়ির চারপাশে ৪০ ঘরে
প্রতিবেশীদের সাথে একাত্ম
হোন।

৫. আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য
একজন মানুষ হোন যিনি
সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে
থাকেন।



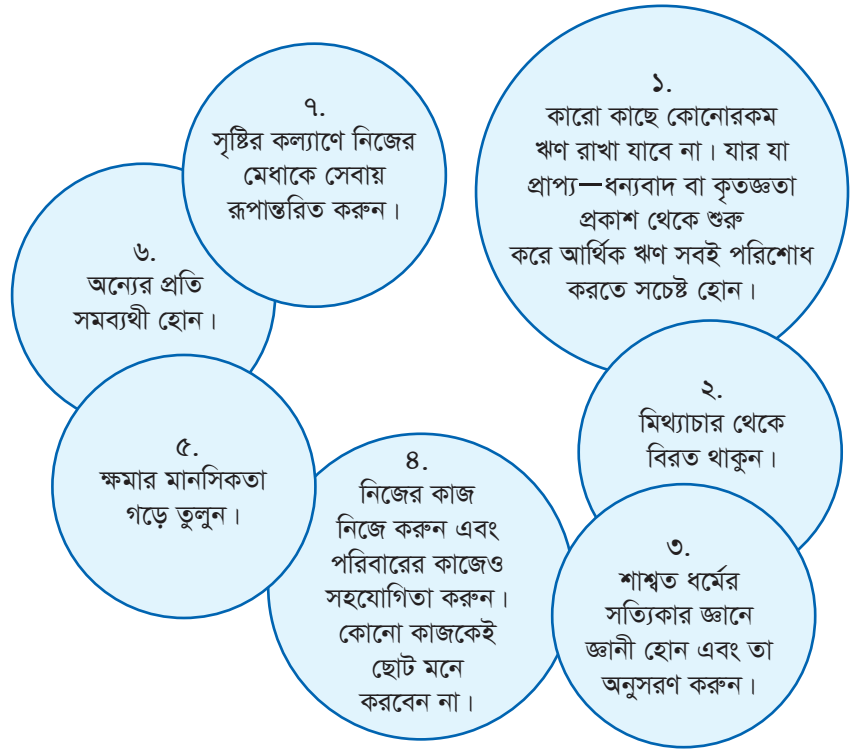
আত্মিক ফিটনেস

‘একটি প্রদীপ যেমন আগুন ছাড়া প্রজ্বলিত হতে পারে না, তেমনি আত্মিক শূন্যতা নিয়ে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না।’—কথাটি হাজার বছর আগে বলে গেছেন মহামতি বুদ্ধ। আজ এই তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে ঠাসা পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা একই কথা বলছেন।

শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের মাপকাঠিতে জীবন্ত থাকাই বেঁচে থাকা নয়। অর্থবিত্ত খ্যাতি ও সাফল্যে ভরপুর জীবনও পরিপূর্ণ জীবন নয়। পণ্য পদমর্যাদা প্রাচুর্য—প্রতিটি প্রত্যাশা পূরণের পরও যে শূন্যতা আর হাহাকার, সেটি দূর করতেই প্রয়োজন আত্মিক উন্নয়ন।

আত্মিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তিই হলো আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সমাজকেন্দ্রিক হওয়া। শুধু নিজের জন্যে নয়, চারপাশে সবার জন্যে বাঁচা, সবার কথা ভাবা।

আত্মিকভাবে ফিট হতে হলে



মেডিটেশন করুন অর্জন করুন টোটাল ফিটনেস

যে-কোনো কিছু জয় করার জন্যে প্রয়োজন টোটাল ফিটনেস। প্রয়োজন শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আত্মিক—জীবনের প্রতিটি দিকের সুন্দর সমন্বয়।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা গত ২৫ বছর গবেষণা করে বলছেন যে, মেডিটেশন বা ধ্যান হচ্ছে ব্রেনের ব্যায়াম। ধ্যান ব্রেনের কর্মকাঠামোকে সুবিন্যস্ত, সুসংহত, গতিময় ও প্রাণবন্ত করে। ব্রেনকে বেশি পরিমাণে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার

করার সামর্থ্য বাড়ায়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং মনকে প্রশান্ত করে, অস্থিরতা উদ্বেগ উৎকর্ষা ও হতাশা থেকে মুক্ত করে। সেইসাথে অসহিষ্ণুতা রুঢ়তা ও অমানবিকতার পরিবর্তে আচরণে আনে বিনয় এবং সমর্মিতা।

শুধু তা-ই নয়, ধ্যান মানুষকে জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করার স্তরে নিয়ে যায়। সত্যটা তখন আপন হয়। অন্তরে যে সুপ্ত শক্তির ভাণ্ডার

রয়েছে এই ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করে দেয় ধ্যান। জীবনকে আশাবাদে ভরিয়ে দেয়। বিশুদ্ধ সম্ভাবনার বলয়ের সাথে আপনার সত্তাকে সংযুক্ত করে। সবমিলিয়ে টোটাল ফিটনেস—শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আত্মিক ফিটনেসের পথ উন্মোচন করে ধ্যান।

তাই ধ্যান করুন। অংশ নিন চার দিনের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। অটুট রাখুন ভাবনার শক্তিকে। অর্জন করুন টোটাল ফিটনেস।

প্রশ্ন : মনছবি করার সময় যে-কোনো লক্ষ্যই আমার কাছে খুব ছোট মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনে অনেক কিছু করব। আবার মনে হয়, এত কিছু করে কী হবে? একদিন তো মরেই যাব! আমি আমার জীবনের মনছবি ঠিক করতে পারছি না। কী করা উচিত?

উত্তর : মারা তো যাবেনই! আমরা সবাই মারা যাব। কিন্তু তার মৃত্যুটাই সম্মানজনক হবে, যার জীবনে অর্জন আছে, মানুষের জন্যে যার অবদান আছে। অর্থাৎ মানুষ যার কাছে ঋণী। আর এমন মৃত্যুর জন্যে আপনাকে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে, আপনার এই দৌদল্যমানতা মানেই হলো আপনি আকাশকুসুম কল্পনার মধ্যে আছেন। আকাশকুসুম কল্পনা আর মনছবি কিন্তু এক নয়।

মনছবি বা মেডিটেশন কোনো আকাশকুসুম কল্পনা নয়, মেডিটেশন হচ্ছে নিজের শক্তিকে অনুভব করার জন্যে ডুবে যাওয়া। নিজের শক্তিকে অনুভব করতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। এজন্যেই মেডিটেশন। যখন আপনার ভেতর থেকে আগ্রহ আসবে, তখন কোনো কাজকে ছোট বা বড় মনে হবে না।

আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। আগে ভাবুন, কোন কোন কাজ আপনার পক্ষে করা সম্ভব। সেভাবে মনছবি নির্ধারণ করুন এবং কাজ শুরু করুন।

প্রশ্ন : আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। করোনার পর থেকে আমার বান্ধবীরা বদলে গেছে—সবাই শুধু ছেলেদের নিয়ে কথা বলে। ক্লাস শেষে তারা লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ ঐ সময় ছেলেরা ক্লাসে যাওয়া শুরু করে। আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী নই বলে তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার কথা হলো, এই বয়সে যদি এসব করি, বড় হয়ে কী করব? আমারও কি ওদের সাথে যোগ দেয়া উচিত? আমি একা হয়ে যাচ্ছি। ওদেরকে কি আমি বন্ধু বলব, নাকি বন্ধু নামের ফাঁদ?

উত্তর : ছেলেদের অধঃপতন হলো কখন? যখন তারা মেয়েদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকত। পড়াশোনা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সবকিছুতে তারা পিছিয়ে পড়তে লাগল। এখন মেয়েরাও যদি ছেলেদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তারাও পিছিয়ে যাবে।

এই বাস্তবতা আমরা চাই না। আমাদের প্রত্যাশা ছেলেমেয়েরা সমানভাবে এগিয়ে যাবে। কারণ সমানে সমান না হলে কখনো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না।

আর যে বয়সে যা প্রয়োজন সে-বয়সে সেটাই করা সমীচীন। আপনি যে এটা বুঝতে পেরেছেন, এজন্যে আপনাকে অভিনন্দন।

আপনার প্রশ্ন

গুরুজীর উত্তর

এখন পড়াশোনা করে নিজেকে গড়ে তোলার সময়। এটা যারা করবে না, তারা ঋণী পাতার মতো জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। কারণ রূপ সাময়িক, আর গুণের কদর চিরন্তন। তাই পড়াশোনা করে যোগ্য হোন, নিজের পরিচয় সৃষ্টি করুন।

মনে রাখবেন, বন্ধুত্ব জোর করে হয় না। বন্ধুত্ব সবসময় সমমনা মানুষের মধ্যে হয়। সমমনা কাউকে না পেলে নিজেই নিজের বন্ধু হোন। একজন ধ্যানীর বন্ধু হচ্ছে তার ধ্যান—আত্মনিমগ্নতা, আর জ্ঞানীর বন্ধু হচ্ছে বই। ধ্যানী ও জ্ঞানীরা সবসময় ব্যতিক্রম।

আপনার জন্যে এ ধরনের বন্ধুত্ব আসলে ফাঁদ। তারা আপনাকে টেনে নিচে নামাবে। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করলে আপনি অনেক বড় হবেন।

একজন ধ্যানীর বন্ধু
হচ্ছে তার ধ্যান—
আত্মনিমগ্নতা, আর
জ্ঞানীর বন্ধু হচ্ছে বই।
ধ্যানী ও জ্ঞানীরা
সবসময় ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন : আমি গত বছর থেকে একজন এতিম শিশুর খরচ দিচ্ছি। কিন্তু এখন একজনকে মেডিটেশন কোর্স করার টাকা দিতে হবে। টাকার স্বল্পতার কারণে দুটো খাতে ব্যয় করতে কষ্ট হবে। তাই এতিমের খরচ বাদ দিয়ে কোর্স করানোটা ভালো হবে, নাকি এতিমের খরচ দেয়াটা উত্তম হবে?

উত্তর : আপনার দুটো নিয়তই খুব ভালো। কিন্তু আপনি যখন এতিমের দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই টাকা আর কোনোকিছুর সাথে জড়াবেন না। ভেবে দেখুন, আপনার রিজিক যদি বন্ধ হয়ে যায়, কেমন লাগবে তখন? অতএব এতিমের খরচ দিয়ে যাবেন।

আর যেহেতু একজনকে কোর্স করানোর নিয়ত করেছেন, তাকে আপনি উদ্বুদ্ধ করুন যেন

সে নিজের টাকায় কোর্স করে। প্রয়োজনে কোর্স একাউন্ট করে দিন। যখন একাউন্ট পূর্ণ হবে সে কোর্স করবে। এতে তারও উপকার হলো।

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে ব্যক্তি নিজের টাকায় কোর্স করে, সে উপকৃত হয় সবচেয়ে বেশি। তখন কোর্সের শিক্ষাগুলোকে সে মূল্যায়ন করতে পারে।

প্রশ্ন : একান্ত প্রিয়জনকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরের উপায় কী? আমার একমাত্র বড় ভাইয়ের অকালপ্রয়াণে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না।

উত্তর : মৃত্যু সবসময়ই দুঃখের, কিন্তু এটা বাস্তবতা। আমরা আপনার প্রতি সমব্যথী।

আর অকালপ্রয়াণ শব্দটা একটা ভুল শব্দ। কারণ মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আয়ু যতদিন থাকবে সেটুকুই তার জীবন। আয়ু শেষ হলে তাকে কেউ রাখতে পারবে না। আবার তাকে ফিরিয়ে আনারও কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার জন্যে অনেক কিছু করার আছে।

আপনি যত সংকর্ম করবেন এবং তা মৃতের জন্যে উৎসর্গ করবেন তত তার আত্মা পরিতৃপ্ত হতে থাকবে। অতএব শোকে ডুবে না থেকে সংকর্মে সময় ব্যয় করুন। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করার সর্বোত্তম উপায় এটিই।

প্রশ্ন : আমি স্মার্টফোন ব্যবহার করি না। কিন্তু টিভি দেখতে পছন্দ করি। স্মার্টফোন ব্যবহার করলে যে ক্ষতি হয়, টিভি দেখলেও কি তেমন ক্ষতি হয়? টিভিও কি আসক্তি সৃষ্টি করে?

উত্তর : টিভিতে কী দেখবেন এবং কতক্ষণ দেখবেন এটা আপনি ঠিক করবেন। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনার কাছে। এর পরিবর্তে যদি টিভি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে, তাহলে আপনি আসক্ত হয়ে পড়বেন। টিভি তখন আপনাকে পেয়ে বসবে।

আসক্তি এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বেছে নেয়া। আর নিয়ম করে সপ্তাহে দুই-তিন দিন ডিজিটাল ফাস্টিং করবেন যে, আজ আমি টিভি দেখব না। তাহলে আপনি আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

শুকরিয়ার প্রকাশ হিসেবে
আমি প্রতিদিন
আমার কাজের পরিমাণ
বাড়াতে থাকব।

কলকাতায় কোয়ান্টাম প্রকাশনা

২-১১ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে কলেজ স্কোয়ার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো ১০ম বাংলাদেশ বইমেলা। ১০ দিনব্যাপী এ বইমেলায় বাংলাদেশের ৭৫টি প্রকাশনা সংস্থার সাথে প্রথমবারের মতো অংশ নেয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, রণানি উন্নয়ন ব্যুরো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি যৌথভাবে এ আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি।

২০২২-এর ডিসেম্বর থেকে কলকাতার বনেদি প্রকাশনা সংস্থা ও পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান দে'জ পাবলিকেশনে পাওয়া যাচ্ছে কোয়ান্টাম প্রকাশিত বই। শুদ্ধাচার, জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন (বাংলা ও ইংরেজি), ভাঙো দুর্দশার চক্র, হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী-সহ কোয়ান্টামের সকল বই ভারতীয় পাঠকেরা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন।



কলকাতার বাংলাদেশ বইমেলায় কোয়ান্টাম প্রকাশনার স্টলে বই দেখছেন আগ্রহী পাঠকেরা

দেশজুড়ে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ইয়োগা সেমিনার



বগুড়া বিয়াম ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টাম ইয়োগা ৥ ৬-৭ ডিসেম্বর

○ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ৥ ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর

১২৭ তম, ১২৮ তম ও ১২৯ তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের ৭৪ জন পুরুষ ও ৪০ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা অংশ নেন।

○ জুডিশিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

৪৩-৪৭ তম স্পেশাল ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও ইয়োগা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বছরব্যাপী ২০৭ জন সহকারী বিচারপতি অংশগ্রহণ করেন।

○ চট্টগ্রাম সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ ৥ ১১ ডিসেম্বর

সারাদেশ থেকে শারীরিক শিক্ষার ৬৫ জন শিক্ষক এতে অংশ নেন।

○ বগুড়া বিয়াম ফাউন্ডেশন ৥ ৬-৭ ডিসেম্বর

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ১৮৬ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে ৪০ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলাসহ মোট ৫০ জন সরকারি কলেজের প্রভাষক এতে অংশগ্রহণ করেন।

○ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন স্টাফ কলেজ গাজীপুর ৥ ১৭-১৮ ডিসেম্বর

১৮৮ তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৫৩ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা প্রশিক্ষার্থী।



হোটেল শেরাটনে মেডিটেশন ও ইয়োগা সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

হোটেল শেরাটনে মেডিটেশন ও ইয়োগা সেমিনার

রাজধানীর বনানীস্থ হোটেল শেরাটনে ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় 'মেডিটেশন এন্ড ইয়োগা : ফর সায়েন্টিফিক লাইফস্টাইল এন্ড টোটাল ফিটনেস, ভিশন এন্ড সাকসেস' সেমিনার। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বনানী গুচ্ছের উদ্যোগে দিনব্যাপী এ সেমিনারের প্রথম সেশনে 'কোয়ান্টাম ইয়োগা ও সায়েন্টিফিক লাইফস্টাইল এন্ড ডায়েট' বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ১৩৪ জন। সেমিনারের দ্বিতীয় সেশন অনুষ্ঠিত হয় 'সিক্রেট অব সাকসেস' বিষয়ে। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ মোট ১৪৩ জন অংশ নেন।



নিজের কাজ, দর্শন ও অবদান দিয়ে পৃথিবী ও সভ্যতাকে ঋণী করে গেছেন যারা—তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গুরুজী আলোকপাত করছেন ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রমগুলোতে। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিনের ধারাবাহিক এ আয়োজনে—

রজার ব্যানিস্টার ভাবনার শক্তি ও বিশ্বাসের অদম্য উদাহরণ



রজার গিলবার্ট ব্যানিস্টার
(২৩ মার্চ ১৯২৯ - ৩ মার্চ ২০১৮)

হাজার বছর ধরে দৌড়বিদরা চার মিনিটে এক মাইল (ঘণ্টায় ২৪ কি. মি.) দৌড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু পারেন নি। অতঃপর তারা ধরে নিলেন—এটা অসম্ভব! বিশেষজ্ঞরা বললেন, ফুসফুসের ক্ষমতা অনুযায়ী এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেউ কেউ বললেন, মানুষের হাড়ের কাঠামো ও পায়ের পেশির গঠন এর অন্তরায়। চারদিকে গুজব ছিল, এমন চেষ্টা কেউ করলে তার ফুসফুস ফেটে যেতে পারে!

দুহাজার বছর পার হয়ে গেল এভাবেই। তারপরই এলো এক অন্যরকম দিন। ২৫ বছর বয়সী এক তরুণ প্রমাণ করলেন, চার মিনিটে এক মাইল দৌড়ানো সম্ভব। ‘আমি পারব’ বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে যিনি আপাত অসম্ভবের বৃত্ত ভাঙলেন, তার নাম রজার ব্যানিস্টার।

ভাবনা ও বিশ্বাস জন্ম দেয় বাস্তবতা

দিনটি ছিল ৬ মে ১৯৫৪। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডে প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রবল বাতাস, আঠালো ট্র্যাক। প্রতিকূল আবহাওয়ায় দ্বিধাবিহীন রজার ভাবছিলেন—দৌড়ে অংশ নেবেন কিনা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগে আবহাওয়া ঠিক হয়ে গেলে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রেস শেষে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা

হলো—রজার ব্যানিস্টার! ঘোষক শুধু বলতে পারলেন, *দ্য টাইম ওয়াজ থ্রি...*। দর্শকের হর্ষধ্বনি এবং হাততালিতে শোনা গেল না বাকি কথা। রজার এক মাইল দৌড়ালেন চার মিনিটেরও কম সময়ে। মানুষ যা অসম্ভব মনে করত, তা-ই সম্ভব হলো।

রজারের সাফল্যের পর এই রেকর্ড ভাঙার হিড়িক পড়ে গেল। এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত চার মিনিটের এই রেকর্ড ভেঙেছেন ১,৬৬৩ জন। একজন রজার ব্যানিস্টারের বিশ্বাস সঞ্চারিত হলো হাজারো প্রাণে। প্রমাণিত হলো—মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে তা সে অর্জন করতে পারে।

নেপথ্যে ছিল ভালবাসা

দৌড় ছিল তার ভালবাসা। তাই প্রচলিত ভ্রাতৃবিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রজার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে অলিম্পিকে দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হন। পরের অলিম্পিকে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে নিজে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনের প্রতিনিধি হয়ে।

রজার ব্যানিস্টার তখন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়ছিলেন। মেডিকেল পড়াশোনার চাপ সামলে স্পোর্টস ক্যারিয়ার চালিয়ে যাওয়া কঠিন। তাই মনস্থির করলেন, ১৯৫২ অলিম্পিকে সোনা জিতে তিনি দৌড় থেকে অবসর নেবেন। কিন্তু বিধিবা! প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হলেন রজার। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ কিছুই পেলেন না!

ব্যর্থতার মাঝেই সুপ্ত আছে সাফল্যের বীজ

অলিম্পিকে ব্যর্থতার পর টানা দুই মাস ভুগলেন বিষণ্ণতায়। ভাবলেন দৌড়ানো ছেড়েই দেবেন! কিন্তু মত বদলালেন। চ্যালেঞ্জ নিলেন—অ্যাথলেটিক ক্যারিয়ার থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বিদায় নেয়া চলবে না। বরং চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দৌড়াবেন, যা কেউ কখনো পারে নি।

কঠোর পরিশ্রম করলেন টানা দুই বছর—দিনে গড়ে চার থেকে ছয় ঘণ্টা অনুশীলন। এরপর যে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন, তা তখন পর্যন্ত ইতিহাসে সর্বনিম্ন সময়ের রেকর্ড।

‘পুরো পৃথিবী অসম্ভব মনে করলেও কাজটি করা সম্ভব’—এই ভাবনা এবং বিশ্বাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি সফল হলেন। এই ধারণাকে বিজ্ঞানে বলা হয় ‘ব্যানিস্টার ইফেক্ট’।

যে-কোনো পরাজয় আরো বড় বিজয়ে রূপ নিতে পারে, যদি মানুষ বিশ্বাস করতে পারে এবং লক্ষ্যস্থির করতে পারে। রজার ব্যানিস্টারের বেলাতেও ঠিক তা-ই হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন, ‘ভাগ্যিস, অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয় করি নি! জয়ী হলে হয়তো আমি তখনই অবসর গ্রহণ করতাম।’

তিনি অনুপ্রেরণার এক বাতিঘর। আমরা তাকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি।

- তার জন্ম লন্ডনের উপকণ্ঠে হ্যারোতে এক শ্রমজীবী পরিবারে।
- স্কুলে থাকাকালে তিনি আবিষ্কার করেন, দৌড়ে তার মেধা আছে। কিশোর বয়সেই তিনি পর পর তিন বার দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন।
- মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করে ১৯৫৪ সালে ডাক্তার হন তিনি।
- ১৯৬৩ সালে তিনি বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট হয়ে বাকি জীবন গবেষণায় অবদান রাখেন।
- রজার যে জুতা জোড়া পায়ে দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন, ২০১৫ সালে সেই জুতা নিলামে বিক্রি হয় দুই লাখ ৬৬ হাজার পাঁচশ পাউন্ডে। এ অর্থ তিনি দান করেন স্নায়ুবিদ্যা গবেষণার দাতব্য এক সংস্থায়।

অন্যেরা অসম্ভব
বলেছে বলে
তুমিও পারবে না—
এমন কোনো কথা নেই।

—রজার ব্যানিস্টার